যুগান্তর

11 APR 2007

মাধ্যমিক শিক্ষার মান নিয়ে কথা চলার পথে

নির্মল সেন

গত ৩ এপ্রিল যুগান্তরের একটি সংবাদ আমাকে অতিরিক্ত করে তুলেছে। সংবাদটির শিরোনাম ছিল 'সিলেটের মাধ্যমিক স্কুলগুলোতে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক সংকট।' মূল বক্তব্য ছিল, বারবার বিজ্ঞপ্তি দিয়েও যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পাওয়া যাচ্ছে না। প্রতিবেদনটির ভাষ্যমতে, এ সংকটের জন্য দায়ী ২০০৬-এর ফেব্রুয়ারি মাসে পাস করা 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন আইন-২০০৫' এবং ২০০৪ থেকে চালু হওয়া শতকরা ৩০ ভাগ মহিলা কোটা। বেশ কয়েকটি স্কুলে নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করে যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীর অভাবে নিয়োগ প্রক্রিয়া বাতিল করতে হয়েছে। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা (মাধ্যমিক) ঘটনার সত্যতা স্বীকার করেছেন বলে প্রতিবেদনটিতে দাবি করা হয়েছে। আমার আতংকের কারণও ওই শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন আইনটি। তারই কারণে সিলেটের আজকের সংকট অচিরেই সারাদেশের সমস্যা হয়ে উঠতে পারে।

আমি আমার নিজ উপজেলা কোটালীপাড়ার একটি মাধ্যমিক স্কুলের বিদ্যোৎসাহী সদস্য। নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল হিসেবে যাত্রা শুরু করা সে স্কুলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক তার প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই বিদ্যমান। সে সুবাদে স্কুলটির ছাত্র, শিক্ষক-কর্মচারীদের সমস্যাগুলো যেমন ভাগাভাগি করে নিতে পেরেছি তেমনি পেরেছি খুব কাছ থেকে নিয়োগ প্রক্রিয়ার আগের পদ্ধতি ও এখনকার পদ্ধতি। আগের পদ্ধতিতে বছরের পর বছর শিক্ষকের শূন্য পদকে শূন্যই থাকতে দেখেছি শুধু প্রক্রিয়াগত জটিলতার কারণে। আর এখন শূন্য পদ শূন্য থাকছে যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পদপ্রার্থীর অভাবে। তার অর্থ, যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষিত যুবা সমাজের ভাগ্যে নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন জোটেনি। নিবন্ধন প্রক্রিয়াটির অপ্রয়োজনীয় জটিলতা ও অস্বচ্ছতার কারণেই যোগ্যতরদের নিবন্ধন এবং প্রত্যয়ন করা সম্ভব হয়নি। অনেক ক্ষেত্রে আবার দেখা যাচ্ছে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অনেক বিজ্ঞান বিভাগের যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক পদপ্রার্থী পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু শূন্য পদটি যে মানবিক বিভাগের। তাই শূন্য পদ শূন্যই থেকে যাচ্ছে। এ আশংকা আমি অনেক আগেই প্রকাশ করেছিলাম। 'বেসরকারি শিক্ষক নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন কর্তৃপক্ষ আইন ২০০৫' পাস হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আইনটির যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলাম। বলেছিলাম পাস করার আগে আইনটির প্রায়োগিক জটিলতা এবং সম্ভাব্য সংকটগুলো সম্পর্কে আদৌ কিছু ভেবে দেখা হয়নি। এ প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান, মানবিক, বাণিজ্য— সব বিভাগের প্রার্থীর 'যোগ্যতার পরিমাপ সম্ভব নয়। আর তা সম্ভব না হলে প্রতিটি বিভাগে প্রয়োজনীয় সংখ্যক নিবন্ধন ও প্রত্যয়নকৃত প্রার্থী কিভাবে পাওয়া যাবে? কারিকুলামে সে ভারসাম্য কোথায়? এভাবে চলতে থাকলে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থায় একটি বড় ধরনের বিপর্যয় ঘটতে পারে। তাই বর্তমান সরকারের উচিত, এখনই নিবন্ধন ও প্রত্যয়ন আইনটি অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা এবং ওই প্রক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট সমস্যাগুলো গভীর ও নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দ্রুত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা। একমাত্র সরকারের দ্রুত, যথার্থ ও বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ সিদ্ধান্তই পারে এ সংকট দূর করতে। সৎ ও ধীশক্তিসম্পন্ন বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেয়া যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে কমিটি গঠন করলে ওই আইনটির ব্যাপক সংশোধন অথবা বাতিলকরণের সুপারিশই সম্ভবত পাওয়া যাবে।'

এখানে মাধ্যমিক শিক্ষা ব্যবস্থার আর একটি বিষয়ের প্রতি সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করব। মুক্তবাজার অর্থনীতির কারণে সবকিছুই আজ বাজারজাতকরণের উপযোগী পণ্য হয়ে পড়েছে। সেই সঙ্গে বাড়ছে প্রতিযোগিতা। প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রটি উৎপাদিত পণ্যের ওপর নয়, বিপণনের ওপর। বিপণনে সব ধরনের কৌশল অবলম্বন করছে মাধ্যমিক স্তরের বইয়ের প্রকাশনা সংস্থাগুলো। সব কৌশলের পাশাপাশি সম্প্রতি বিপণনের ক্ষেত্রে এক ধরনের অপকৌশল পরিলক্ষিত হচ্ছে। এ অপকৌশলের সুবিধাভোগী শ্রেণী দুটি। একটি প্রকাশনা সংস্থাগুলো, অপরটি জেলা-উপজেলা পর্যায়ের শিক্ষক সমিতিগুলোর কতিপয় নেতা। প্রতি শিক্ষাবর্ষেই ছাত্রছাত্রীদের হাতে একটি বুকলিস্ট ধরিয়ে দেয়া হয় এবং বুকলিস্টে উল্লিখিত প্রকাশনা সংস্থার বই কিনতে বাধ্য করা হয় ছাত্রছাত্রীদের। আবার এই বইগুলোর মূল্য এনসিটিবি নির্ধারিত বইয়ের চেয়ে এমনকি চারগুণ পর্যন্ত বেশি! গুণগত মান ও এনসিটিবি নির্ধারিত বইয়ের তুলনায় অনেক কম। অর্থটা তাহলে কি দাঁড়াল? সুবিধাভোগী দুটি শ্রেণীর কতিপয় দুর্বৃত্তের দুর্বৃত্তায়নের বলি হচ্ছে লাখ লাখ শিক্ষার্থী। উপজেলা-জেলা শিক্ষক সমিতিই এই বুকলিস্ট তৈরি করে থাকে। ব্যতিক্রম কিছু স্কুল হয়তো আছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা যেমন ধর্তব্যের মধ্যে নয়, তেমনি সেসব স্কুলের শিক্ষক-ছাত্রদের নানা ধরনের হয়রানির শিকার হতে হয় সমিতি কর্তৃক। প্রকাশনা সংস্থাগুলো যে মোটা অঙ্কের টাকা সমিতিকে প্রদান করে বিপণনে সাফল্য অর্জন করছে, সে টাকাটাই অস্বাভাবিক রকমের বেশি মূল্যে বই বিক্রির মাধ্যমে তুলে নিচ্ছে। এনসিটিবি নির্ধারিত বইয়ের মূল্যের সঙ্গে ওইসব নব্যগুণ প্রকাশনা সংস্থার বইয়ের মূল্যের সামান্য তুলনাই ছাত্র-অভিভাবকের প্রতি চলমান আর্থিক বিশ্লেষণের বিষয়টির একটি ভয়াবহ চিত্র ফুটে উঠবে। শুধু নবম শ্রেণীর ইংরেজি, বাংলা ব্যাংকরণ বইয়ের মূল্যের তুলনা করলে দেখা যায় এনসিটিবি নির্ধারিত বাংলা ব্যাংকরণ বইটির মূল্য যেখানে ৪০.৬০ টাকা সেখানে বিশেষ বিশেষ প্রকাশনা সংস্থাগুলোর বইয়ের মূল্য ২০০ থেকে ২৪০ টাকা পর্যন্ত। ইংরেজি গ্রামারের ক্ষেত্রে এনসিটিবি'র বইয়ের মূল্য ৫৬ টাকা, বিপরীতে ওইসব প্রকাশনা সংস্থার বইয়ের মূল্য ২৩০ থেকে ২৯০ টাকা পর্যন্ত। সত্যি আমি এ কথাটা বুঝতে অপারগ যে, আর্থিক বিশ্লেষণের এত নিষ্ঠুর উচ্চমাত্রা সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে কিভাবে চলছে! সরকারের কাছে আমার ঐকান্তিক অনুরোধ, বিষয়টাকে দয়া করে হালকাভাবে নেবেন না। এখনই একটা কিছু করুন। অর্থাভাবে ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা যাতে জ্যামিতিক হারে না বাড়ে, তার জন্য আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে যোগসাজশকারী সংশ্লিষ্ট সব দুর্বৃত্তকে। ভেজালবিরোধী অভিযানের মতো একটা অভিযান দরকার আর সে অভিযানের জন্য একটি আইনি কাঠামো দরকার, যা সরকারকেই দিতে হবে। সবশেষে বর্তমান সরকারের কাছে বলব, বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সার্বিক উন্নয়ন তথা শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য অনেকবার অনেকভাবেই লিখেছি। রাজনৈতিক সরকারগুলোর কাছে আবেদন, নিবেদন করেছি অসংখ্যবার। কোন সুফল পাইনি। ব্যাপক দুর্নীতি, অনিয়ম এবং সর্বোপরি একটি স্বচ্ছ ও বাস্তবসম্মত শিক্ষানীতি প্রণয়নের যে দাবি শুধু উপেক্ষিত হয়েছে, তা বলব না, তাকে নিয়ে রীতিমতো তামাশা করা হয়েছে। অতীতের স্বৈরশাসকদের কাছেও লজ্জার মাথা খেয়ে সেসব দাবির পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করতে গিয়ে নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করেছি। যুদ্ধ করেছি কারণ স্বৈরশাসকদের কাছে কিছু চাইতে গেলে আবার স্বৈরশাসনবিরোধী অবস্থানের মধ্যে কেউ কেউ নমনীয়তা খুঁজতে পারে। তারপরও আমার সুদীর্ঘ সাংবাদিক ও রাজনৈতিক জীবনে ত্যাগ এবং ধৈর্যের বিনিময়ে, নির্যাতন ও কারাবাসের মাধ্যমে অর্জিত একটি তাত্ত্বিক আদর্শের মানব সংস্করণ এই 'আমি'কে গৌণ করে প্রাধান্য দিয়েছি দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার সুসমন্বিত অগ্রগতিকে। তারপরও ব্যর্থ হয়েছি। এবারের পটভূমি ভিন্ন রকমের। একটু যেন আলোর আভা লাগছে প্রায়ান্ধ এই চোখ দুটিতে। তাই অনেক আশায় বুক বেঁধে এখন আবার লিখছি।

শিক্ষার প্রায় সব স্তর নিয়েই জোট সরকারের আমলে লিখেছি, ফলাফল শূন্য হওয়ায় কেঁদেছি আর ভেবেছি এই শিক্ষা ব্যবস্থা দেশের শিক্ষার্থীদের কোথায় নিয়ে দাঁড় করাবে? আর তারাইবা এই শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে দেশটাকে নিয়ে যাবে কোথায়, কোন্ অন্ধকারে?

নির্মল সেন : সাংবাদিক